Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.357
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2505I5VXIIIP0071
e-ISSN No. 2394-8426
Monthly Issue
MAY-2025
Issue–V, Volume–XIII

Nazrul Islam's play 'Aleya'

Researcher: Dibakar Das
Supervisor: Dr. Barun Kumar Chakraborty
Seacom Skills University
Depart of Bengali

Abstract - The words that come to our mind when we hear the word 'Aleya'. In rural areas, dead bodies are buried in empty spaces or the bodies of various animals are buried in soft soil in secluded places or in swamps filled with sedges. In the darkness of the night, methane gas is produced from under the water and comes out under pressure. When it comes into contact with oxygen in the air, a light purple fire is created, creating a spooky atmosphere. The common people are afraid of that scene and think it is a spooky thing. The appearance of this fire is both real and unreal. When a traveler loses his way in the dark, he tries to find his destination by seeing this light. When the light goes out, he loses his way and gets lost. This game of light and darkness is known as Aleya to the people of rural Bengal. Like a purple flame in human life, love sometimes plays a positive role and finds a sea of happiness, and sometimes, when it plays a negative role, it immerses life in a sea of filth and ruins it. A close reading of the play shows that we live a hazy life like Aleya. The statement that playwright Nazrul has made about the play in the introduction and prologue before the start of the main play gives us a proper idea about the content of the play. The playwright has mainly wanted to show the love story through three men and three women.

Keywords - Aleya, hazy, three men-women, symbol.

নজরুল ইসলামের নাটক 'আলেয়া'

গবেষকঃ দিবাকর দাস
তত্ত্বাবধায়কঃ ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি
বাংলা বিভাগ

সারাংশ - 'আলেয়া' শব্দখানি শুনলেই যে কথাগুলি আমাদের মাথায় আসে। গ্রামাঞ্চলে ফাঁকা জায়গায় মৃত মানুষের দেহ কবর দেওয়া কিংবা বিভিন্ন জীবজন্তুর শবদেহ নির্জন স্থানে নরম মাটির তলায় পোঁতা অথবা কচুরিপানা ভর্তি জলাভূমি জলের নিচ থেকে রাত্রের অন্ধকারে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়ে চাপে বাইরে বেরিয়ে হাওয়ায় থাকা অক্সিজেনের সংস্পর্শে হালকা বেগুনি রংয়ের আগুন তৈরি হয়ে এক ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করে। সাধারণ মানুষ সেই দৃশ্য দেখে ভয় পায়, ভৌতিক ব্যাপার মনে করে। এই আগুনের ফুলকি বের হওয়া বাস্তব অবাস্তব দুইভাবেই মানুষের কাছে গ্রহণীয়। অন্ধকারে কোন পথিক পথ হারিয়ে ফেললে এই আলো দেখে তার গন্তব্য স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আবার আলো নিভিয়ে গেলেই পথ হারিয়ে দিকভ্রষ্ট হয়ে যান। আলো আঁধারের এই খেলা গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে 'আলেয়া' নামে পরিচিত। মানুষের জীবনেও বেগুনি রঙের শিখার মতোই ভালোবাসা কখনও ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে জীবনকে সুখ সাগরের সন্ধান দেয় আবার নেতিবাচক ভূমিকা নিলে পঙ্কিল সাগরে নিমজ্জিত করে জীবনকে ছারখার করে দেয়। নাটকের নিবিড় পাঠে বুঝতে পারি, আমরা আলেয়ার মতোই কুহেলিকাময় জীবনযাপন করি। মূল নাটক শুরুর আগে ভূমিকা ও প্রস্তাবনায় নাট্যকার নজরুল নাটক সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা দেয়। নাট্যকার মূলত তিনজন পুরুষ ও তিনজন নারীর মাধ্যমে ভালোবাসার লীলা দেখাতে চেয়েছেন।

সূচক শব্দ- আলেয়া, কুহেলিকাময়, তিনটি পুরুষ-নারী, প্রতীক।

মূল গবেষণা প্রবন্ধ- নজরুল ইসলামের লেখা দ্বিতীয় নাটক 'আলেয়া'। এই নাটক তিন অঙ্কের। কোন দৃশ্য বিভাগ নেই। পৌষ, ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে 'কুহেলিকা' উপন্যাস, 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থ ও নজরুল স্বরলিপি ইত্যাদি গ্রন্থগুলির সঙ্গে 'আলেয়া' গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়েছে। মজার বিষয় মঞ্চে জনপ্রিয়তা লাভের পরে এটি প্রকাশ পায়। প্রকাশক গোপাল দাস মজুমদার, ডি.এম. লাইব্রেরি। মুদ্রাকর নরেন্দ্রনাথ কোঙার, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, ৮+৭২, ১ টাকা। উৎসর্গে লেখা 'নটরাজের চিরনৃত্যসাথী সকল নটনটীর নামে আলেয়া উৎসর্গ করিলাম।' এই নাটকের প্রথম নাম ছিল 'মরুতৃষ্ণা'। পরবর্তীকালে সেই নাম পরিবর্তিত হয়ে 'আলেয়া' হয়।

নাট্যকার নজরুল নাটকটির ভূমিকায় মূলকথা বলে দিয়েছেন-

"এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালোবাসা- আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলা-ভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হ'তে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে... 'আলেয়া' তারি ইঙ্গিত।" (ভূমিকা)

১

নাট্যকারের কথাগুলি নিবিড় পাঠ করলে বলতে পারি, এই পৃথিবী ধূলিকণাময় অর্থাৎ জীবন আলো অন্ধকারময়। জীবনে প্রেম ভালোবাসা অনেকটা আলেয়ার আলোর মতো। প্রকৃতিতে আলেয়া যেমন আলো আঁধারির মায়ার জগৎ নির্মাণ করে ঠিক তেমনই প্রেম ভালোবাসা মানুষের জীবনেও কখনও আনন্দ, কখনও সুখ নিয়ে আসে। আবার কখনও কখনও দুঃখে ভরিয়ে তোলে। হতাশায় জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। আলেয়ার সৃষ্টি হয় সাধারণভাবে ভেজা নরম আলগা মাটিতে। তেমনি আবেগী নরম মনের মানুষের হৃদয়ে দুঃখ-হতাশা-আনন্দ প্রত্যাশা বেশি থাকে। আলেয়ার মায়ায় কখনও কখনও পথিক কোন পথ পান না, হারিয়ে যান। তেমনই মানুষের জীবনে ভালোবাসা প্রেম যখন থাকে তখন জীবন আনন্দের হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় মানব জনম সার্থক। কিন্তু প্রেম ভালোবাসা হারিয়ে গেলে জীবন পঙ্কিল সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। হতাশাময় জীবনে বেঁচে থাকার ইচ্ছে শেষ হয়ে যায়। জীবন অন্য খাতে বইতে থাকে। যেসব হতাশাগ্রস্ত দুঃখী মানুষ জীবন যুদ্ধে লড়াই করতে পারে না তাদের জীবন শেষ হয়ে গেছে মনে করে তারা জীবন যুদ্ধে হেরে যান। তবুও মানুষ আলেয়ার দিকে ধেয়ে যায়। ঠিক যেমন কিছু নরম আবেগী মানুষ কোন কিছু বিচার বিবেচনা না করেই নারী সঙ্গ পেতে চায় ও নিজের বিপদ নিজেই ডেকে নিয়ে আসে। পতঙ্গ যেমন লেলিহান শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহতি দেয় ঠিক তেমনই।

২

'আলেয়া' নাটকে রূপকধর্মিতা সমাজের তিন প্রতিনিধি স্থানীয় পুরুষ ও নারী চরিত্র উপস্থাপন করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের মাধ্যমে তিনি সমগ্র মানবজাতির জীবনে প্রেম ভালোবাসার সাফল্য ব্যর্থতা আলেয়াময় জীবন সার্থকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন-

"তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী- চিরকালের নর-নারীর প্রতীক- এই আগুনে দগ্ধ হল, তাই নিয়ে এই গীতিনাট্য।"

তিনটি পুরুষ চরিত্রের প্রথম চরিত্র হলো মীনকেতু। তিনি রুপপিয়াসী। রূপের প্রতি মোহ তার বরাবরের। অপর চরিত্রটি হলো চন্দ্রকেতু। তিনি আবার ত্যাগের প্রতীক। একজন সত্যিকারের গুণের অধিকারী আদর্শ চরিত্র। অন্য চরিত্রটি হলো উগ্রাদিত্য তিনি ক্ষমতায়ন, শক্তির উপর অগাধ আস্থা রাখেন। তাঁর ক্ষমতার দম্ভ জীবনে নানান চড়াই-উৎরাই নিয়ে আসে।

পুরুষ চরিত্রের মতো নারী চরিত্রগুলিও সমাজের তিন নারী শ্রেণির প্রতিনিধি। বলা ভালো, এই তিন শ্রেণির নারী চরিত্র থেকে প্রায় সমগ্র নারীজাতির চিত্র আমরা পাই। কৃষ্ণা ভালবাসতে চায় কিন্তু মন কোথাও স্থায়ী হয় না। তার ভালোলাগা সময়ে সময়ে পাল্টে যায়। স্থির চিত্তের মানুষ সে নয়। আমাদের সমাজে এমন চরিত্র হামেশাই দেখা যায়। আলোচ্য নাটকে মীনকেতুর মতোই।

দ্বিতীয় নাড়ি চরিত্র জয়ন্তী ক্ষমতা লোলুপ। লক্ষ্য তার স্থির। সেই লক্ষ্যে একদিন সে পৌঁছাতে পারে। রাণী হয়। নাট্যকারের মতে, তেজই তার আসল শক্তি। সে তার সেনাপতি উগ্রাদিত্যকে ভালোবাসে। তার মৃত্যুতে কষ্ট পায়। ত্যাগ স্বীকার করে।

তৃতীয় চরিত্র চন্দ্রিকা সমাজের আদর্শ চরিত্র। এমন চরিত্রের নারীদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কৌতুহল সবসময়ের। সে চিরকালের কুসুমপেলব প্রাণ চাঞ্চল্য পরিপূর্ণ হয়েও পৌরুষ কঠোর পুরুষকে ভালবাসতে চায়। তাকে মরুভূমির মরিচিকা না বলে বরং বনশ্রী বলতে পারি। ক্লান্ত, শ্রান্ত মানুষজনকে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা'র মতো দুদণ্ড শান্তি দিতে পারে, মানুষের জীবন সংগ্রামের শেষে তার কল্যাণ করতে পারে। এমন নারীকে পাওয়ার জন্যে পুরুষ সারাজীবন মনে মনে তপস্যা করে। চন্দ্রিকার মতো নারী দিক বিভ্রান্ত মানুষকে পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। মৃত্যু পথযাত্রী মানুষকে জীবনে বাঁচার রসদ খুঁজে দেয়। শুধুমাত্র তার জন্যই পশুসম খারাপ মানুষ ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারে অর্থাৎ দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হতে পারে।

নাট্যকার নিজেই তিনজন নারী চরিত্রের পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন-

প্রথম চরিত্র- "কৃষ্ণা- চির-কালের ব্যর্থ-প্রেম নারী, জীবনে সে কাউকে ভালোবাসতে পারলে না- এই তার জীবনের চরম দুঃখ।"

দ্বিতীয় চরিত্র- "জয়ন্তী- যে-তেজে যে-শক্তিতে নারী রাণী হয়, নারীর সেই তেজ সেই শক্তি।"

এবং তৃতীয় চরিত্র- "চন্দ্রিকা- চিরকালের কুসুমপেলব প্রাণচঞ্চল নারী, যে শুধু পৌরুষকঠোর পুরুষকে ভালোবাসতে চায়। মরুভূমির পরে যে বনশ্রী, সংগ্রামের শেষে যে কল্যাণ, এ তাই। এরই তপস্যায় পশু নর মানুষ হয়, মৃত্যুপথের পথিক প্রাণ পায়।..."

তিনি এই নাটকের প্রস্তাবনার ঠিক আগে নিজের নাটক, চরিত্র, বিষয় সম্পর্কে লিখছেন, নারীদের ভালোবাসা কুহেলিকাময়। তাদের হৃদয় দেওয়া নেওয়ার খেলায় কখন কাকে যে পথভ্রষ্ট করে আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। তাদের মনে কাকে স্থান দেওয়া হবে সেটি একমাত্র ওরাই জানে। তাদের ভালোবাসা কখন কার উপর বর্ষিত হয় কেউ জানে না। এই রহস্য চিরকালের। যাকে সে এতোদিন ধরে অবজ্ঞা করে এসেছে, হয়তো সে এখন দূরে চলে গিয়েছে এবার তাকে কাছে পেতে চায়। হয়তো এতো দিন যাকে সে চেয়ে এসেছে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা না করে প্রতিদ্বন্দ্বীর পিছনে পড়ে যায়। আবার কিছু কিছু পুরুষও এক হৃদয় থেকে আর এক হৃদয়ে নিজের মনের মতো মানসীকে খুঁজে বেড়ায়। তাদের কাছে আজ যে সুন্দর, ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ আগামী কাল সেটি বাসি হয়ে যায়। হৃদয়ের এই তীর্থ ভ্রমণ তাদের শেষ হয় না। তাই তারা এক মন্দিরে পুজো দিয়ে অন্য কোন মন্দিরের বেদীতলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে। নাট্যকার এই হৃদয়ের আনাগোনায় চির রহস্যময় বিচিত্র সুন্দরের দেখা পেয়েছেন। নাট্যকার নজরুল বলেছেন এই নাটক 'তারি ইঙ্গিত'। নাট্যকারের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে-

"নারীর হৃদয়-তাদের ভালবাসা কুহেলিকাময়। এও এক আলেয়া। এ যে কখন কা'কে পথ ভোলায়, কখন কা'কে চায়, তা চির-রহস্যের তিমিরে আচ্ছন্ন।

প্রস্তাবনার শুরুতে নাট্যকার ইঙ্গিত দিয়েছেন অন্ধকার নিশীথিনী পরিবেশ যেখানে মাঝে মাঝে আলো জ্বলে উঠছে আবার মাঝে মাঝে নিভে যাচ্ছে। দিশেহারা পথিক সেই হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলোর পিছনে ছুটে যাচ্ছে, গান করছে এবং পথ হারাচ্ছে। এমত পরিবেশে এই গান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্ধকারে পথ পাওয়ার চেষ্টায় তার গান-

"নিশি নিশি মোরে ডাকে সে স্বপনে।
নিরাশার আলো জ্বালিয়া গোপনে।
জানিনা মায়াবিনী কি মায়া জানে,
কেবলি বাহিরে পরাণ টানে...।" (প্রস্তাবনা)

বোঝা যাচ্ছে, এই মায়াবী আলোর ঝলকানিতে পথিক পথ হারিয়ে ফেলে মায়ার জগতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়। সে পথ পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়ে দেয়।

এই মায়াবী পরিবেশে দুটি প্রজাপতি আসে। তারা গান ধরে। সেই গানের বিষয়বস্তু পথহারা পথিককে আরও মায়ার জগতে নিয়ে যাওয়া। তাকে পথভ্রষ্ট করা। নিয়ন আলোয় উদভ্রান্ত পথিক যেন কোনোদিন বাস্তব জীবনে না ফিরে যায় সেই চেষ্টা করা। নাট্যকার নজরুল এই রূপকের মাধ্যমে মানব জীবনের কামনা বাসনার ফলে মানুষ কিভাবে পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে তাই দেখাতে চেয়েছেন। যাইহোক, এখানে প্রজাপতিদের গানটি উল্লেখ করা যায়-

"দুলে আলো শতদল ঝলমল ঝলমল।
চল লো মেলি পাখা রঙীন লঘু চপল।।
যদি অনল-শিখায় এপাখা পুড়িয়া যায়
ক্ষতি কি-ভালবাসায় জ্বলিতে আসা কেবল...।।" (প্রস্তাবনা)

গানের শেষে প্রজাপতি দুটি আলেয়ার কাছে যেতেই আলো নিভে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় বেশ কয়েকজন রক্ত মাংসের কিশোরী যারা সারা শরীরে ফুলের সাজ পরে আছে তাদের দেখা যায়। দেখা যায়, প্রজাপতি ও সেই কিশোরীরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতি ও মানব একাকার হয়ে গিয়েছে। তারা একসঙ্গে গান শুরু করে-

"মোরা ফুটিয়াছি বঁধু
হের তোমারি আশায়।"(প্রস্তাবনা)

গান শেষে প্রজাপতি দুটি ও কিশোরীরা উষার দীপ্তির কাছে না থাকতে পেরে অন্ধকারের যবনিকা টেনে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রস্তাবনায় নাট্যকার আলো আঁধারির মায়ার জগৎ নির্মাণ করে নাটক লেখার মূল উদ্দেশ্য বা বিষয় বললেন।

নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবনায় যেমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল ঠিক তেমনই গান্ধাররাজের প্রমোদ উদ্যানে এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে, বৃহৎ রাজপ্রাসাদের কাছেই পর্বতমালা, সেখান থেকে ঝর্ণাধারার কুলু কুলু শব্দ, ভোরের আলো রক্তিম আভা নিয়ে ধীরে ধীরে ফুটছে, এমত পরিবেশে অসংখ্য সুন্দরী তরুণী গান ও নাচ করে গান্ধার রাজ মীনকেতুকে অন্য আকর্ষণের জগতে নিয়ে গিয়েছে। সারা রাত্রি উপভোগ করার পর মীনকেতু যেন মত্ত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি তরুণী কিশোরীদের কারোর গালে, কারোর অধরে নিজ তর্জনী দিয়ে মৃদু টোকা দিচ্ছেন, কারোর চুলের খোঁপা খুলে দিচ্ছেন, বেণী ধরে টানছেন। রাত্রি শেষ হতে চললেও কামনার আগুন শেষ হয়নি। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন এখনও অনেক বাকি। একজন রাজা তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ভুলে এক কামুক ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তিনি যেন কবি হয়ে ওঠেন-

“হাঁ, ঠিক বলেছ কবি, চোখ পুরে রূপ চাই, পাত্র পুরে সুরা চাই (হঠাৎ হাসিয়া তরুণী ও কিশোরীদের কাছে গিয়া) তুই কে রে?- বসরা গোলাব বুঝি? বাঃ, যেমন রং, তেমনি শোভা, ঠোঁটে গালে লাল আভা যেন ঠিকরে পড়ছে।... তুই- তুই বুঝি ইরাণী নার্গিশ?... হাঁ, নার্গিশ ফুলের পাপড়ীর মতোই তোর চোখ! ভুরু তো নয়, যেন বাঁকা তলোয়ার; আর তার নিচেই ওই চকচকে চোখ যেন তলোয়ারের ধার! ওহ্ তাতে আবার কালো কাজলের শান দেওয়া হ’য়েছে। একবার তাকালে আর রক্ষে নেই! (বুকে হাত দিয়া) একেবারেই ইসপার উসপার! (অন্য দিক দিয়া) আহা, তুমি কে সুন্দরী? তুমি বুঝি বঙ্গের শেফালি। (কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) শেফালি ফুলের মতই তোমার শোভা, শেফালি-বৃন্তের মতই তোমার প্রাণ বেদনায় রাঙা!- আর তুমি? তুমি বুঝি সুদূর চীনের চন্দ্র-মল্লিকা? তোমার এত রূপ, কিন্তু তুমি অমন ভোরের চাঁদের মত পাণ্ডুর কেন? আ! তোমার বুঝি এদেশে মন টিঁকছে না? তা কি করবে বলো, না টিকে উপায় নেই! আমি যে তোমাদের চাই। গাও, গাও, মন টেঁকার গান গাও! যে-গান শুনে সকালবেলার ফুল বিকালবেলার কথা ভুলে যায়, ভোরের নিশি সূর্যোদয়ের কথা ভোলে; বনের পাখী নীড়ের পথ ভোলে- সেই গান”। (প্রথম অঙ্ক)

আলোচ্য নাটকে আমরা দেখি, মীনকেতুর রাজ্যে সীমা অতিক্রম করে যশল্মীরের রাণী জয়ন্তী, এক নারী হয়েও বিজয় অভিযান সম্পূর্ণ করেছে। এই খবর শুনে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত মীনকেতু বলেছে-

“ও মরুচারিণী- মায়াবিনী, চিরকালের চির- বিজয়িনী। সে তার প্রতি চরণ পাতে শুষ্ক মরুর বুকে মরুদ্যান রচনা ক’রে চলে, পাষাণের বুক ভেঙে অশ্রুর ঝর্ণাধারা বইয়ে দেয়, পাহাড়ের শুষ্ক হাড়ে নিত্য নূতন ফুল ফোটায়-এ সেই নারী। মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদগণ! আমার অপরাজেয় সৈন্যদলের এই প্রথম পরাজয়-নারীর হাতে, সুন্দরের হাতে, এ আমারই পরাজয়, তোমাদের সম্রাটের পরাজয়, যৌবনের রাজার পরাজয়। এখনই ঘোষণা ক’রে দাও, আমার সাম্রাজ্য জু’ড়ে উৎসব চলুক, আনন্দের সহস্র দীপালী জ্বলে উঠুক! ব’লে দাও, আজ তাদের রাজাকে পরাজিত ক’রে তাদের রাজলক্ষ্মী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছে? আমার এই রাজসভা এখনি উৎসব-প্রাঙ্গণে পরিণত হোক।” (প্রথম অঙ্ক)

মীনকেতু জয়ন্তীর বীরত্বে, সৌন্দর্যে মোহিত হলেও তার মনে বাসা বেঁধে আছে আর এক আদিম প্রবৃত্তির প্রতীক উগ্রাদিত্য। কামনা বাসনায় সেনাপতি উগ্রাদিত্যও কম যায় না। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখি, জয়ন্তীর কাছে উগ্রাদিত্য শান্ত মূর্তি হয়ে ভালো মানুষ সাজার চেষ্টা করেছে। জয়ন্তীর জয় এখানেই। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে জয়ন্তীকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার জন্য উগ্রাদিত্য ও মীনকেতুর মধ্যে অসুস্থ লড়াই বেঁধে যায়। সে লড়াইয়ে মীনকেতুর কাছে উগ্রাদিত্য পরাজিত হয়েছে। উগ্রাদিত্যের পরাজয়ের মুহূর্তে জয়ন্তী বিষণ্ণ হয়েছে। সে চেয়েছে উগ্রাদিত্য জিতুক।

৩

নাট্যকার নজরুল ‘আলেয়া’ রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মায়ার খেলা’ নাটকের কাহিনির সামান্য প্রেরণা নিয়ে থাকতে পারেন বলে আমাদের মনে হয়। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা ও রাণী’, ‘রাজা’ এবং ‘শাপমোচনের’ নাটকের ভাব-আদর্শ নজরুলকে কিছুটা অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে বলে মনে হয়েছে। তবু ‘আলেয়া’ রূপে, রসে, রোমাঞ্চে স্বতন্ত্ররূপে নজরুল ইসলামের সৃষ্টি, দৃষ্টিনন্দন শ্রুতিরঞ্জন প্রমোদপালা। ১৩৩৮, বৈশাখ থেকে পৌষ ‘জয়তী’ পত্রিকায় এবং পৌষ ‘নাচঘর’ পত্রিকায় ‘আলেয়া’র গানগুলি প্রকাশিত হয়। সেসময় ‘নাচঘর’ পত্রিকার ৯ পৌষ প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রতিবেদনে ‘আলেয়া’ নাটক সম্পর্কে যা জানতে পারি তার একটি অংশ এখানে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি-

“নাট্যনিকেতন পুরানো প্রথা লঙ্ঘন করে নিজস্ব নূতন রীতি প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী। তাই সেখানে যখন গীতিনাট্য খোলা হল আমরা দেখতে পেলাম নজরুল ইসলামের ‘আলেয়া’। গীতিনাট্য লেখার যোগ্যতা জীবিত বাঙালি লেখকদের মধ্যে নজরুল ইসলামের চেয়ে বেশি আর কারো

নেই। প্রথমতঃ তিনি কবি, তাছাড়া তিনি সুরশিল্পী। বাঙলা সঙ্গীতে তিনি সম্পূর্ণ একটি নতুন ঢঙ প্রবর্তন করেছেন। হিন্দি রাগ রাগিণী ভেঙে, মিশিয়ে নানারকম সুর সৃষ্টি করতে তিনি ওস্তাদ। এই নজরুলের 'আলেয়ার' এমন একটি জিনিস রয়েছে যা অত্যন্ত High brow থেকে আরম্ভ করে সাধারণ দর্শক পর্যন্ত সবাই উপভোগ করেছেন, আলেয়া রূপক নাট্য; তার বিষয়বস্তু হচ্ছে নরনারীর প্রেম। গল্পাংশ খুব ক্ষীণ; বহু গানের মাঝে মাঝে অল্প ডায়লগ ছড়ানো। টেকনিকের দিক থেকে একেবারে খাঁটি Musical comedy। গানগুলির ভাষা আর সুর দুইই অনিন্দনীয়। নজরুলের যেটুকু করবার তিনি খুব ভালো করেই করেছেন।"[১] ('নাচঘর' পৌষ ১৩৩৮, ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের 'বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

ঐ পত্রিকাতেই সুবিখ্যাত সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'আলেয়া' সম্পর্কে (নাচঘর ২ পৌষ ১৩৩৮) লিখেছিলেন-

"'আলেয়া' গীতিনাট্য। সাধারণ নাটক অপেক্ষা ইহাতে গান অধিকতর আছে বলিয়া ইহার গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে সমস্ত গানের অন্তরালে একটা বিচিত্র ঘটনাবহুল কাহিনি ইহাকে নাটকও করিয়া তুলিয়াছে। রত্নহারে রত্ন যেমন শোভা পায় কবির অপরূপ গানগুলি এই কাহিনির মধ্যে তেমনি শোভা পাইয়াছে। 'আলেয়া'র নাটকাংশ যেন তাহার দেহ, সংগীতাংশ যেন তাহার প্রাণ।"

আলোচ্য নাটকে আমরা দেখতে পাই, নায়ক মীনকেতু একজন রূপ-সুন্দর মানুষ। তিনি 'যৌবনের রাজা' বলে নিজেকে মনে করেন। তিনি যেকোন সময়, যখন খুশি, যাকে ইচ্ছে প্রেমের বাহন করতে পারেন। এটা তার অহঙ্কার। এহেন মীনকেতুর পরাজয় হলো মরুচারিণী মায়াবিনী যশল্মীরের অধীশ্বরী জয়ন্তীর কাছে। এটা মীনকেতুর মেনে নিতে বড় কষ্ট হয়েছে। যাইহোক, জয়ন্তী হচ্ছে সেই নারী, যে তেজে, যে শক্তিতে একজন নারী রাণী হয়ে ওঠে। নারীর সেই তেজ সেই শক্তি জয়ন্তীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। জয়ন্তী যখন মীনকেতুর রাজ্য আক্রমণ করলো, তখন মহিমা-সুন্দর ও ত্যাগ-সুন্দর সেনাপতি চন্দ্রকেতু তাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। শেষে অমৃতসমা, লক্ষ্মীস্বরূপা জয়ন্তীকে পণ রেখে তার শক্তি, লোভ, ক্ষুধা প্রভৃতি সবকিছুর প্রতিমূর্তি সেনাপতি উগ্রাদিত্যের সঙ্গে মীনকেতুর দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিকল্পনা করে উগ্রাদিত্যকে হত্যা করে। সেসময় জয়ন্তীর কনিষ্ঠা সহোদরা চন্দ্রিকা আসে। সে প্রতিজ্ঞা করে যে মহাভারতের সাবিত্রীর মতো তপস্যা করে সে উগ্রাদিত্যকে বাঁচিয়ে তুলবে। এরপর মীনকেতুকে নমস্কার করে জয়ন্তী বলে-

"বন্ধু! নমস্কার। আমি তোমার বন্দী করতে এসেছিলুম, হয়তো-বা বন্ধন নিতেও এসেছিলুম। কিন্তু সে বন্ধন আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ছিন্ন হয়ে গেল। উগ্রাদিত্যের মৃত্যুর সাথে সাথে আমার হৃদয়ের সকল ক্ষুধা, সকল লোভের অবসান হয়ে গেল! আমি আজ রিক্তা সন্ন্যাসিনী। (একটু থামিয়া) আমি এই সুদূর পৃথিবীতে সন্ন্যাসিনী হতে আসিনি। বধূ হবার, জননী হবার তীব্র ক্ষুধার আগুন জ্বেলে তোমাকে জয় করতে এসেছিলুম। তোমাকেও পেলুম, কিন্তু বুকের সে আগুন, আমার নিভিয়ে দিয়ে গেল উগ্রাদিত্য।" (তৃতীয় অঙ্ক)

মীনকেতু বলেন,

"জয়ন্তী! তুমিও কি তবে ওকে ভালোবাসতে? জয় করেও কি আমার পরাজয় হ'ল? উগ্রাদিত্য ম'রে হলো জয়ী। যাকে পণ রেখে জয় করলুম- সে কি আপন হলো না।?" (তৃতীয় অঙ্ক)

তখন জয়ন্তী উত্তর দেয়-

"কায়াহীন ভালোবাসা নিয়ে যারা তৃপ্ত হয়, তুমি তো তাদের দলের নও মীনকেতু। তুমি চাও জয়ন্তীকে, এই মুহূর্তের রিক্তাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না। যে তেজ যে দীপ্তির জোরে তোমায় জয় করলুম- সেই তো ছিল উগ্রাদিত্য। তোমার হাতে পতন হয়ে গেছে। বন্ধু। বিদায়।" (তৃতীয় অঙ্ক)

এরপর যখন মীনকেতু জিজ্ঞেস করলে তাদের আর দেখা হবে কিনা, তখন জয়ন্তী বলে-

"হয়তো হবে, হয়তো-বা হবে না। যদি আমার মনে আবার সেই ক্ষুধা জাগে, যদি উগ্রাদিত্য প্রাণ পায়··· আবার আমি আসব।···" (তৃতীয় অঙ্ক)

এখানেই নাট্যকার নাটকের ইতি টেনেছেন।

8

নজরুল জীবনীকার মুজফফর আমহদ একসময় বাঙালি ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার গিরিবালা দেবীর কাছে শুনেছিলেন, 'আলেয়া'র গানগুলি নজরুলের দ্বিতীয়বার নতুন করে লেখা। প্রথমবারের খাতাটি নাকি হারিয়ে যায় অথবা চুরি হয়ে যায়। 'আলেয়া'র মতো জনপ্রিয় গীতিনাট্যের গানগুলির সুর সংরক্ষিত করা হয়নি। অনেক গানের কোন স্বরলিপি নেই, অর্থাৎ মূল সুরগুলি রক্ষা করার বা উদ্ধার করার কোন চেষ্টাই হয়নি। স্বরচিত গানের দৌলতে নজরুল নিজেই 'আলেয়া' লিখে মঞ্চ অধিকার করতে চাইলেন। নির্দেশনা দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকশিল্পী সতু সেন। আঠাশটি গানের পরিচালক ছিলেন স্বয়ং নজরুল। সতু সেনের মতো পাকা নাট্যকর্মীর পরিচালনায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য ভূপেন রায়, তারাসুন্দরীদের মতো তারকার অভিনয়ে এবং নজরুল ইসলামের মতো সংগীত আয়োজকের গানে সমৃদ্ধ হয়ে শনিবার, ৩ পৌষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে, ইংরাজিতে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩১ নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হল। নতুন ধরণের এই নাটক বড়দিনের কলকাতা শহরকে মাতিয়ে দিল। নাট্যনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা প্রবোধচন্দ্র গুহ ছিলেন নাট্যপ্রযোজক। অভিনয় করেছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য (মীনকেতু), ভূমেন রায় (চন্দ্রকেতু), জ্ঞান দত্ত (কবি মধুশ্রবা), তারাসুন্দরী (রানী জয়ন্তী) নীহারবালা (ঘূর্ণি), নিরুপমাদেবী (ঝঞ্ঝা), কমলাদেবী (বিদ্যুৎ), বীণাপানিদেবী (বৃষ্টিধারা) প্রমুখ। নাটকের পক্ষে খুব স্মরণীয় ঘটনা এই যে, 'আলেয়া' নাটকে নজরুলকে একবার অভিনয় করতে হয়েছিল। কবি মধুশ্রবা চরিত্রে জ্ঞান দত্ত অসাধারণ অভিনয় করতেন। তাঁর গানের গলাও ছিল চমৎকার। একদিন নাটক শুরুর আগে জ্ঞান দত্তের দেখা নেই। প্রবোধবাবুর তো অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কোন উপায় না দেখে নজরুল ইসলামকে মধুশ্রবা চরিত্রে অভিনয় করবার প্রস্তাব দেন। নজরুল ইসলাম এর জন্য মানসিক প্রস্তুত ছিলেন না। প্রবোধবাবু বলে বসেন-

"তোমার নাটক, তোমার কথা, তোমার গান। সে গান তুমিই শিখিয়েছ। অতএব তুমিই কবি সেজে স্টেজে নেমে আমাদের মান বাঁচাও।"

বেচারা নজরুলের তখন 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' অবস্থা। অগত্যা মঞ্চে নামতে বাধ্য হলেন নজরুল। দর্শকের দিকে পিছন ফিরে বসলেন। সংলাপ বললেন, গানও গাইলেন। কিন্তু দর্শকদের একবারও শ্রীবদন দেখালেন না। দৃশ্য শেষ হতেই তড়িঘড়ি চলে এলেন সাজঘরে। পাছে আবার মঞ্চে ঢুকতে হয় এই ভেবে কোনো মতে সাজ ছেড়ে পিছনের দরজা দিয়ে দিলেন ছুট। এদিকে মঞ্চে আবার মধুশ্রবার ঢোকার সময় হয়ে এল। প্রবোধবাবু সেকথা জানাতে এলেন নজরুলকে। কিন্তু কোথায় কবি নজরুল? আর কোথায়-বা কবি মধুশ্রবা? ড্রেসম্যান জানালেন, নজরুল ড্রেস ছেড়ে ফুরুৎ। প্রবোধবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। দর্শকদের কথা ভেবে তাঁর হার্টবিট দ্রুত ওঠানামা করছে। কিন্তু কথায় আছে না- কপালের নাম গোপাল। দেবদূতের মতো হাজির হলেন জ্ঞান দত্ত। দেরি হওয়ার কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি মেকাপ করে স্টেজে নেমে পড়লেন।

কবি যখন নাট্যকার হন তখন গীতিপ্রধান নাটকে গানগুলির সাহায্যে নাটকীয় সংঘাতের অনেকখানি ব্যক্ত হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, নাটকীয় ভাবধারার সঙ্গে অনেকগুলি গান (যেমন- 'যৌবন-তটিনী ছুটে চলে ছলছল', 'বেসুর বীণার ব্যথার সুরে বাঁধব গো', 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা', 'গহীন রাতে-ঘুম কে এলে ভাঙাতে' ইত্যাদি) এর সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু কতকগুলি গান (যেমন- 'এসেছে নবনে বুড়ো যৌবনেরি গাড়ি- সভাতে', 'খুঁচি খুঁচি সূচি-সারি হাঁড়ি মুখে কালো দাড়ি' ইত্যাদি) সচেতন উদ্দেশ্যের আভাসজড়িত বলে নীতিধর্মের সত্যিকার অনিবার্যতা থেকে বঞ্চিত।

৫

নাট্যকার নজরুল 'আলেয়া'র মধ্যে রূপক-সাংকেতিক নাট্যরীতি-প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। তবে রূপক-সাংকেতিক নাটকের মতো প্রতি কথায় ও গানে যে দ্যুতি ও দীপ্তি ঝলসে ওঠা উচিৎ, অসীমের যে গভীর স্পন্দন ও আভাস কাম্য, তা এই নাটকে অনেকাংশে অনুপস্থিত। 'আলেয়া' কিসের ইঙ্গিত বা সংকেতের বাহক তার পরিচয় নাট্যকার গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়েছেন তা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাট্য সমালোচকেরা এই নাটককে একটি সার্থক নাটক বলতে চান না। কারণ, গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, একটি সার্থক নাটকের জন্য একটি ভালো কাহিনীর প্রয়োজন। তাঁর Poetics নামক গ্রন্থে চরিত্র-চিত্রণ অপেক্ষা, কাহিনীকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কথায়-

"In a play accordingly they do not act in order to portray the Characters; they include the Characters for the sake of the action."[২]

তবে অ্যারিস্টটলের পরবর্তীকালে স্টল প্রভৃতি নাট্যসমালোচকের কেউ কেউ তাঁর মতের সমর্থক হলেও অনেকেই কাহিনীর চেয়ে চরিত্র-চিত্রণের উপর বেশী গুরুত্ব দিতে চান। তাঁদের মতে কাহিনী, ঘটনাসমাবেশ, পরিস্থিতিসৃষ্টি প্রভৃতি সব কিছু সহযোগে চরিত্র চিত্রণের উৎকর্ষ-

বিচারে নাটক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ হয়৷ নিকলের মতে 'a penetrating and illuminating power of characterization'-ই হচ্ছে নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান মাপকাঠি৷ হেনরী আর্থার জোনস তো খোলাখুলিভাবে মন্তব্য করেছেন-

"Story and incident and situation in theatrical work are, unless related to character, comparatively childish and unintellectual."[৩]

৬

আমরা জানি যে, একটি শ্রেষ্ঠ নাটকের পক্ষে কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ উভয়েরই বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে৷ তবে নাটকের প্রয়োজনানুসারে কখনও কখনও এই দুইয়ের কোন একটির প্রভাব বেশি দেখা যেতে পারে৷ আমাদের আলোচ্য 'আলেয়া' নাটক কি কাহিনীবিন্যাস, কি চরিত্রচিত্রণ কোন দিকেই চরম সার্থক বলা যায় না৷ কাহিনীবয়ন ও চরিত্রাঙ্কনে বাস্তবধর্মিতার অভাব বিশেষভাবে দেখা যায়৷ তবে এর মধ্যে একমাত্র কবি মধুশ্রবার চরিত্রটিই কিছু জীবন্ত ও সার্থক বলে মনে হয়েছে৷

নাট্যসমালোচকদের মতে, সংলাপ নাটক-রচনার একটি অপরিহার্য উপকরণ৷ সংলাপ- পদ্য বা গদ্য যেকোন রীতিতেই হতে পারে৷ তবে এই সংলাপ নাটকের ক্রিয়াকে যাতে অতিক্রম না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার৷ গীতিনাট্যের গানগুলি যদি নাটকীয় ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে, তবে সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, নাটকের পক্ষে তাদের কোন মূল্যই নেই৷ নাটক সবসময় বাস্তবধর্মী জীবনের রসরূপ, তাই সংলাপের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই উক্তিগত বাস্তবতার চাহিদা থাকে৷ সেই জায়গায় এ নাটকে সুরময় সংলাপ রচনার দিক দিয়ে নজরুল ইসলাম কিছুটা হলেও কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন৷ তবে তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমরা বলবো, সংলাপের গীতিধর্মীতা 'আলেয়া'র অনেক জায়গাতে নাটকীয় ক্রিয়ায় স্বাভাবিক বিস্তারে ব্যাঘাত করেছে৷

৭

নাটক যতই তত্ত্বপ্রধান ও রূপক-সংকেতময় হোক না কেন, তাকে বাস্তবিক হয়ে উঠতে হয়৷ আলোচ্য নাটকের চরিত্রগুলি কতকগুলো ভাব বা আইডিয়ার বাহক বা প্রতিমূর্তি বলে অনেক সময় মনে হয়েছে৷ আসল ব্যাপার হলো নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপের মধ্যে সুসংমিশ্রণ ঘটলে তবেই একটি নাটক বাস্তব জীবনের রসরূপ হয়ে ওঠে, নজরুল এই নাটকে তা যথাযথভাবে ঘটাতে পারেননি৷ তাই এই নাটক দর্শকদের মনে অভীষ্ট রসনিষ্পত্তি সার্থকভাবে করতে পারেন নি৷

আসলে কবি সত্তা নাট্যকার নজরুলের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে৷ তবে উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতেই পারি, মূলধারার নাট্যকারদের মতো না হলেও নিজেকে একজন নাট্যকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন৷ একজন রূপক নাট্যকার হিসাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন৷

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. ইসলাম, রফিকুল, 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, পৃষ্ঠা– ৫৭০৷
২. গুপ্ত, সুশীলকুমার, 'নজরুল-চরিতমানস', ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৫, দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৮৫৷
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮৫৷

গ্রন্থপঞ্জি

১৷ ইসলাম, নজরুল, 'আলেয়া ও ঝিলিমিলি', ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, পৌষ, ১৩৩৮৷
২৷ ইসলাম, রফিকুল, 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি', দ্বিতীয় সংস্করণ, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯১৭৷
৩৷ গুপ্ত, সুশীলকুমার, 'নজরুল-চরিতমানস', তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৭৷
৪৷ ঘোষ, অজিত কুমার, 'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ', সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৫৷
৫৷ ঘোষ, জগন্নাথ, 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস', প্রজ্ঞা বিকাশ, বইমেলা, কলকাতা, ২০০৯৷

পত্রিকাপঞ্জি

১৷ 'অন্য শশিভূষণ', অনামিকা মুখার্জী, হিজল, সৌরভ রায় (সম্পাদক), বর্ষ-২৩, সংখ্যা-২. আলিপুরদুয়ার, ডিসেম্বর, ২০১৬৷

২। ‘কাজী নজরুল ইসলাম’ (বিশেষ সংখ্যা, তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক তপন মণ্ডল ও শামস আল দীন, তবু একলব্য, দি গৌরি কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, ভল্যুম-২৮, ইস্যু- ২, নম্বর-৫১, জুলাই, ২০২২।

৩। ‘নজরুল; শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য’, সম্পাদক: বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, বিমল মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, পল্লব সেনগুপ্ত, সুকুমার দেব, গনেশ বসু, জয়তী ঘোষ, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নেতাজি ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৯।